দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে মৌলিক বিষয়গুলোতে জন-সচেতনতা কতটুকু কার্যকর?

১. ভূমিকা

গত বছরের শেষ দিকে চীনের উহান প্রদেশে এক নতুন ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দেয়। এটিকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে চীন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে তা গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ প্রথম রিপোর্ট করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গবেষণা করে ৭ জানুয়ারি ২০২০ এটিকে "করোনা ভাইরাস" নামে অভিহিত করে এবং এর ছড়িয়ে পড়া ও মৃত্যুর ভয়াবহতাকে বিশ্লেষণ করে ৩১ জানুয়ারি জরুরি জনস্বাস্থ্য বা "Public health emergency" ২০২০ ঘোষণা করে। ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাসের নতুন নামকরণ করে "কোভিড-১৯"।

১.১ কোভিড-১৯ বিশ্ব পরিস্থিতি

১৬ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ (১৯, ৯৫, ৯৮৩)। এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৭ জন[১]। ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর প্রায় ১৮০ টি দেশে দিন দিন আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

১.২ বাংলাদেশ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে প্রথম ৩ জন কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায় ৮ মার্চ ২০২০ তারিখে। এরপর ১৫ মার্চ ২ জন, ১৬ মার্চ ৩ জন, ১৭ মার্চ ২ জন, ১৮ মার্চ ৪ জন এভাবে ৩ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত রোগীর সংখ্যা কমবেশি একই হারে পাওয়া যেতে থাকে। ৪ এপ্রিল থেকে আক্রান্তের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে। ১৬ এপ্রিল এ সংখ্যা আক্রান্তের সংখ্যা স্বাস্থ্য প্রশাসন ও গণমাধ্যমসহ সকলকে উদ্বিগ্ন করে। এদিন ২৪ ঘন্টায় শনাক্তকৃত আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৪১ জনে। ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১,৫৭২।

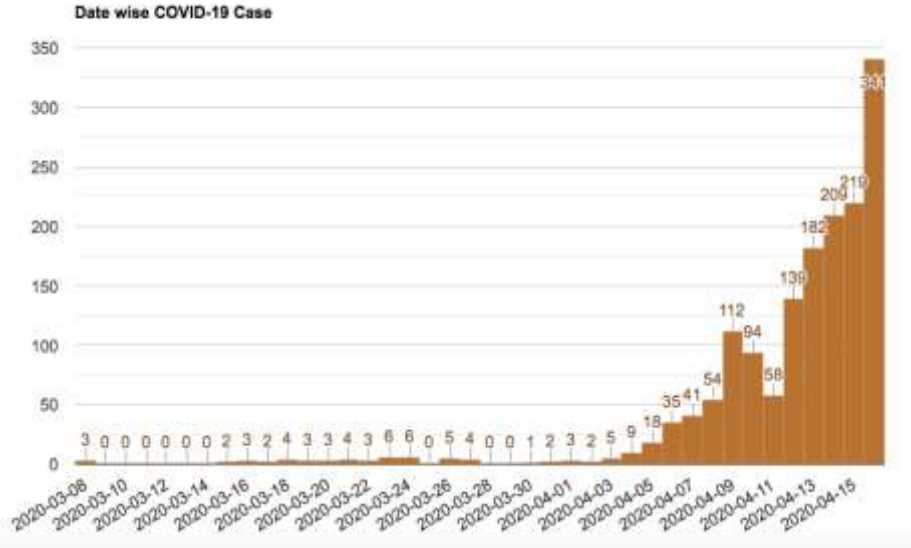

সূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ১৭ এপিল ২০২০।

শুরুর দিকে দৈনিক মৃত্যুর হার এক অংকে থাকলেও গত ১৬ এপ্রিল ২০২০ তা দুই অংকে পৌছে যায়। ঐদিনের মৃত ১০ জন নিয়ে বাংলাদেশে মোট ৬০ জন কোভিন-১৯ আক্রান্ত রোগী মৃত্যুবরণ করেন। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ৫৯ জন[২]। উল্লেখ্য যে, শুরুর দিকের তুলনায় স্যাম্পল পরিক্ষার হারও অনেক বেড়েছে। ১৬ এপ্রিল ২৪ ঘন্টায় মোট ২০১৯ টি স্যাম্পল

[1] *https://covid19.who.int*
[2] *www.dghs.gov.bd*

পরীক্ষা করা হয় যার মধ্যে ৩৪১ জনকে কোভিড-১৯ রোগী বলে সনাক্ত করা হয়। স্যাম্পলের সংখ্যা অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৯.২ শতাংশ। যা একই সময়ে ইটালি, স্পেন ও যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্তের হারের চেয়েও বেশি[৩]।

১.৩ পুরো দেশ রয়েছে ঝুঁকিতে

বাংলাদেশ সরকার দেশকে এখন কোভিড-১৯ সংক্রমনের ক্ষেত্রে "ঝুঁকিপূর্ণ" বলেছে। জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষকদের তথ্য মতে বাংলাদেশ এখন কোভিড-১৯ সংক্রমনের ৩য় স্তরে রয়েছে, অর্থাৎ এ সময় সমাজে এর দ্রুত বিস্তার ঘটে। চতুর্থ স্তর হলো যখন মৃত্যুর সংখ্যা সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছে। সম্ভবত আগামী সপ্তাহেই বাংলাদেশ চতুর্থ পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে[৪]।

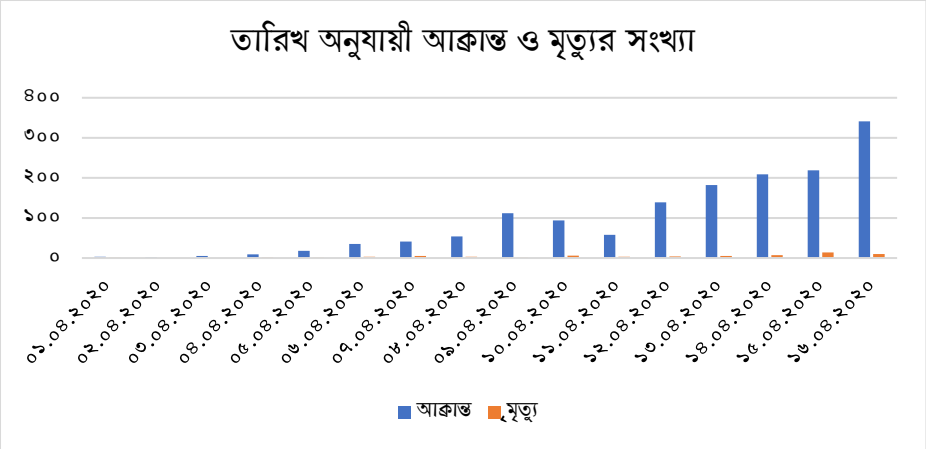

সূত্র: কোস্ট ট্রাস্টের বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী।

বর্তমানে দেশে ৩৩,৩০০ মানুষ হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন এবং ৩,২৭৪ জন রয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে। দেশের মোট ৪০টি জেলায় এই সংক্রমণের বিস্তার ঘটেছে। ঢাকা এবং নারায়নগঞ্জে সবচেয়ে বেশি রোগী সনাক্ত হলেও সারা দেশ রয়েছে সংক্রমণের ঝুকিতে। সরকার তাই ১৬ এপ্রিল দেশকে "সংক্রমণের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ" আখ্যা দিয়ে এক সার্কুলার জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, এই ভাইরাস দেশের অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। যেহেতু এই ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষ সংক্রমিত হয় তাই শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা না গেলে এই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। সংক্রমন এড়াতে মানুষ ঘরে থাকবেন। একান্ত জরুরি না হলে কেউ ঘর থেকে বের হবেন না এবং সন্ধ্যা ৬.০০টা থেকে সকাল ৬.০০টা পর্যন্ত সময়ে কেউ ঘরের বাহির হলে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে[৫]।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনার সাথে মিলিয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি, বেসরকারি অফিস-আদালতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এনজিও এই জনসচেতনতা কার্যক্রমকে আরো জোরদার করেছে। তারপরেও ঠেকানো যাচ্ছে না এর সংক্রমণ বা মৃত্যুর হার। প্রশ্ন উঠেছে, সকল প্রস্তুতি নেয়া স্বত্বেও কেন এমন হলো? তাহলে মানুষ কি যথেষ্ট সচেতন হননি? নাকি মানছেন না কোভিড-১৯ সংক্রমন প্রতিরোধের মৌলিক বিষয়গুলো? নাকি অন্য কোন কারণ এর পেছনে দায়ী? এই অজানা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতেই কোস্ট ট্রাস্টের এই সমীক্ষার অবতারণা।

সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল দু'টি-

১. বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনস্বাস্থ্য সচেতনতা নিরূপণ করা।
২. সুরক্ষার বিষয়গুলো ব্যক্তিজীবনে সাধারণ মানুষ কতটুকু পালন করছেন তা যাচাই করা।

---

[3] *Coronavirus: A storm brewing, The Daily Star, 17 Apri,l 2020.*

[4] *Ridwanur Rahman, medicine and infectious disease specialist, quoted this report-- Coronavirus: A storm brewing, The Daily Star, 17 April 2020*

[5] *Public notice, DGHS, 16 April, 2020.*

৩. সমীক্ষা পদ্ধতি

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধমে উপকূলীয় অঞ্চলের (কোস্ট কর্ম এলাকা) দুইটি বিভাগ যথাক্রমে (বরিশাল ও চট্টগ্রাম), দুইটি জেলা (কক্সবাজার ও ভোলা), দুইটি উপজেলা (উখিয়া ও চরফ্যশন), ইউনিয়ন পর্যায়ের ২ টি গ্রাম, (উত্তর জালিয়া পালং, উখিয়া উপজেলা এবং চরমানিকা, চরফ্যশন উপজেলা) এবং দুইটি চর এলাকা (কুতুবদিয়া ও চর মোতাহার) কে নমুনায়নের জন্য বাছাই করে সরাসরি ১০০ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। "র‍্যাপিড রিসার্চ" বা দ্রুত গবেষণা সম্পাদনের মাধ্যমে ফলাফল জানার ক্ষেত্রে নমুনায়নের স্থান ও উত্তরদাতার সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে।

৩.১ সাধারণ মানুষের সংজ্ঞা:

নিম্নআয়ের ও দৈনিক ভিত্তিক শ্রমজীবী মানুষ, যারা তাদের পেশা ও প্রয়োজনের কারণেই বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন, পাশাপাশি দারিদ্রের কারণে ঘরে থাকা যাদের পক্ষে কঠিন, ঘরে অবস্থান করার মতো পর্যাপ্ত স্থান ও সুবিধাদি যাদের নাই, এমন মানুষকেই উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সমীক্ষায় যেসব পেশা ও শ্রেণী অবস্থানের মানুষের উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে তারা হলেন–

- কৃষক,
- দৈনিক খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ,
- হকার, ক্ষুদ্র বাবসায়ী,
- ক্ষুদ্র ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, নিম্ন আয়ের কর্মচারী (যার বেতন ১০–১২ হাজার টাকার মতো),
- অন্যর বাড়িতে কাজে সহায়তাকারি ব্যক্তি,
- ভিক্ষুক
- ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির দরিদ্র সদস্য।

৪. সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য

সমীক্ষায় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র অনুযায়ী, ২০টি প্রশ্ন থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে সে অনুযায়ীই তা নিচে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

৪.১ ব্যক্তিগত তথ্য

উত্তরদাতাদের মধ্যে নারী ছিলেন ৪৭% এবং পুরুষ ৫৩%।

উত্তরদাতাদের বয়স ছিল ১৮–২৫ বছরের মধ্যে ১২%, ২৬–৩৫ বছর ৩৯%, ৩৬–৪৫ বছর ৩২%, ৪৫–৬০ বছর ১২% এবং ৬১+ বয়সী ছিলেন ৫% ব্যক্তি।

পেশার বিবেচনায় কৃষক ছিলেন ১০%, জেলে ১%, শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন ১৮% ,ক্ষুদ্র বাবসায়ী ১৯%, চাকরিজীবী ৮% এবং অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত এমন উত্তরদাতা ছিলেন ৪৫%।

উত্তরদাতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বিভাগীয় পর্যায়ে ২০%, জেলা ২১%, উপজেলা ১৫%, ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে ২৪% এবং চরাঞ্চল এলাকায় ২০%।

৪.২ সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সচেতনতা ও পালন করা বিষয়ে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য

১. করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায় বলে মনে করেন?

এমন প্রশ্নের উত্তরে ২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন পানির মাধ্যমে, ১৪% বলেছেন বাতাসের মাধ্যমে, ৭৪% বলেছেন রোগীর সংস্পর্শ ও হাঁচি–কাশির মাধ্যমে এবং ১০% উত্তরদাতা জানিনা বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ এখনও ২৬% মানুষের মাঝে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে ও কিভাবে করোনা ভাইরাস ছড়ায় সেই বিষয়ে সচেতনতা আসেনি।

২. কিভাবে বুঝবেন আপনি করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন?

এমন প্রশ্নের উত্তরে ১৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, জ্বর ও হাঁচি-কাশি হলে বোঝা যাবে, ২৮% বলেছেন জ্বর, হাঁচি-কাশি ও গলা ব্যথা হলে বোঝা যাবে, ৪৭% বলেছেন জ্বর, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হলে বুঝতে হবে আমি আক্রান্ত হয়েছি। ১০% জানিনা বলে উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ, ৫৩% উত্তরদাতা এখনও আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক তথ্য ও লক্ষণ সম্পর্কে অবগত নন।

৩. করোনা প্রতিরোধে সাবান বা লিকুইড দিয়ে ন্যূনতম কত সময় ধরে হাত ধুতে হয়?

উত্তরদাতাদের ৭% বলেছেন ৫- ১০ সেকেন্ড ধুলেই হবে। ৬২% বলেছেন ২০-৩০ সেকেন্ড। ১২% বলেছেন ১ মিনিট। ৭% বলেছেন ২ মিনিট এবং এ বিষয়ে কিছুই জানেন না এমন উত্তর দিয়েছেন ১২%। অর্থাৎ ৩৮% সাধারণ মানুষ এখনও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্ত থাকার উপায় হিসেবে হাত ধোয়ার সঠিক নিয়মটি জানেন না।

৪. করোনা প্রতিরোধ করতে হলে কিভাবে ও কখন হাত ধোয়া উচিত?

নিচের চার্ট বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, এখনও ৪৯% মানুষ হাত ধোয়ার মৌলিক বিষয়টি জানেন না। অর্থাৎ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে কিভাবে ও কখন হাত ধোয়া উচিত।

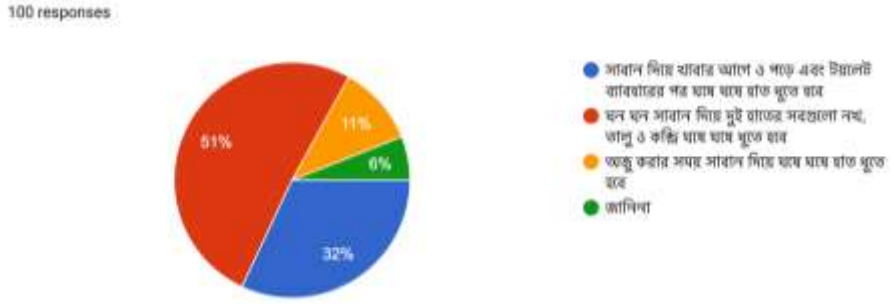

৫. আপনি কি হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে উপরের সঠিক নিয়মটি মেনে চলেন?

এই প্রশ্নর উত্তরে ৫৭% উত্তরদাতা মনে করেন যে তিনি হাত ধোয়ার সঠিক নিয়মটি সবসময় মেনে চলেন। মাঝে মাঝে মেনে চলেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৩৩%। জানেন কিন্তু মেনে চলেন না এমন সংখ্যা ৮% এবং এটিকে প্রয়োজনীয় মনে করেন না ২%। অর্থাৎ সমীক্ষা মতে এখনও ৪৩% মানুষ হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম মেনে চলেন না।

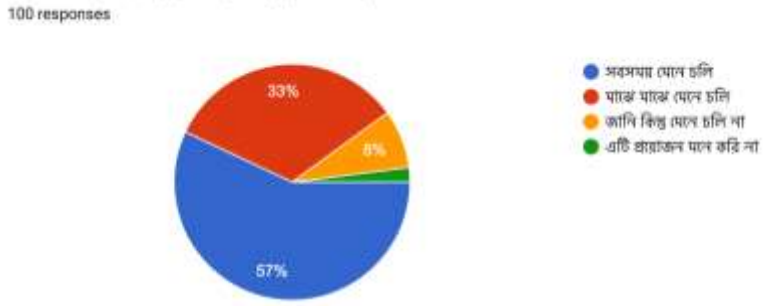

৬. হাঁচি বা কাশি দেবার সময় কী করতে হবে?

উত্তরদাতাদের ২৯% বলেছেন যে দুইহাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁচি-কাশি দিতে হবে। ৩% বলেছেন যে করোনা আক্রান্ত না হলে কোনকিছু দিয়ে মুখ ঢাকার দরকার নেই। ৬৪% বলেছেন যে টিস্যু বা রুমাল ব্যবহার করা, টিস্যু বা রুমাল না থাকলে হাতের কনুই এর ভাজে হাঁচি-কাশি দেয়া এবং ৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে তারা এ বিষয়ে কিছু জানেন না। অর্থাৎ ৩৬% মানুষ হাঁচি বা কাশি দেয়ার সময় পালনীয় শিষ্টাচার সম্পর্কে জানেন না।

৭. হাঁচি-কাশি, সর্দি বা জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে অন্তত কত দুরত্বে থাকা উচিত?

উত্তরদাতাতের মধ্যে ৩% বলেছেন যে ১ ফুট দূরত্বে। ৪% বলেছেন ২ ফুট। ৭৬% বলেছেন ৩ ফুট। ৯% বলেছেন ৪ ফুট এবং জানিনা বলেছেন ৮% উত্তরদাতা। ২৪% উত্তরদাতার এ সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার নয়।

৮. আপনি কতদিন পর পর বাজার করেন?

নিচের ছকে দেখা যাচ্ছে, এক সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে বাজারে যান না মাত্র ৩৭% উত্তরদাতা। বাকি ৬৩% মানুষ ঘন ঘন বাজারে যাচ্ছেন, অপরিচিত মানুষের সাথে মিশছেন।

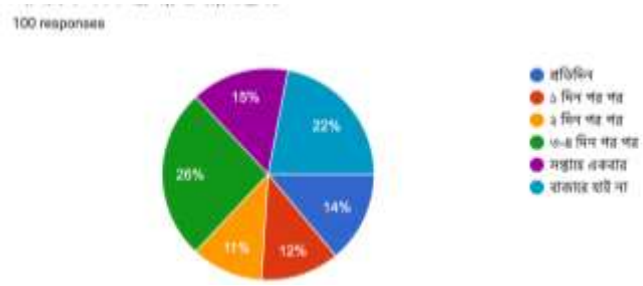

৯. কোথায় নামাজ পড়েন বা উপাসনা করেন?
ঘরে নামাজ পড়ছেন ৭৩% উত্তরদাতা। অর্থাৎ এখনও ২৭% লোক মাঝে মাঝে বা নিয়মিতভাবে উপাসনালয়ে যাচ্ছেন। আসন্ন রমজান মাসে যা আরো বাড়তে পারে।

১০. আপনার এলাকার মসজিদে নামাজির সংখ্যা এখন কেমন?
আগের মতই আছে বলেছেন ৫% উত্তরদাতা। কমেছে বলেছেন ৬৫.৭%। বেড়েছে বলেছেন ১% এবং ইমাম-মুয়াজ্জিন মিলে সর্বোচ্চ ৫ জন নামাজ পড়েন এমন উত্তর দিয়েছেন ২৮.৩% উত্তরদাতা। অর্থাৎ মাত্র ২৮.৩% মসজিদে সরকারি নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে।

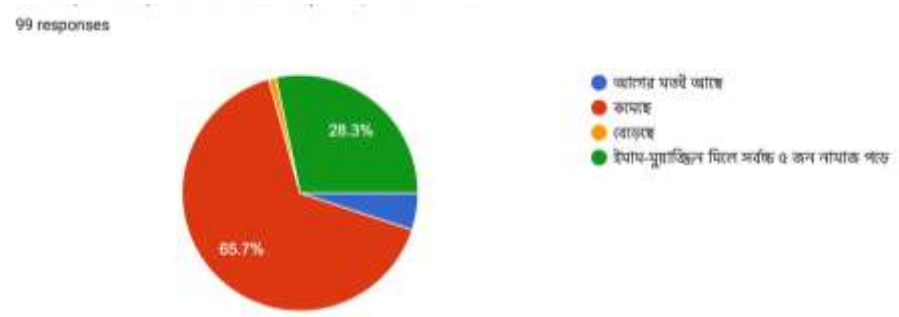

১১. ঘর থেকে বের হলে আপনি অন্যের সাথে কতটুকু শারীরিক দূরত্ব (সামাজিক দূরত্ব) বজায় রাখেন?
উত্তরদাতাদের ৫% বলেছেন ১ ফুট দূরত্ব বজায় রাখি। ৪% বলেছেন ২ ফুট। ৭১% বলেছেন ৩ ফুট এবং দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না বলেছেন ১৬%। অর্থাৎ এখনও ২৯% মানুষ শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখা সম্পর্কে সচেতন নন বা এটি মানেন না।

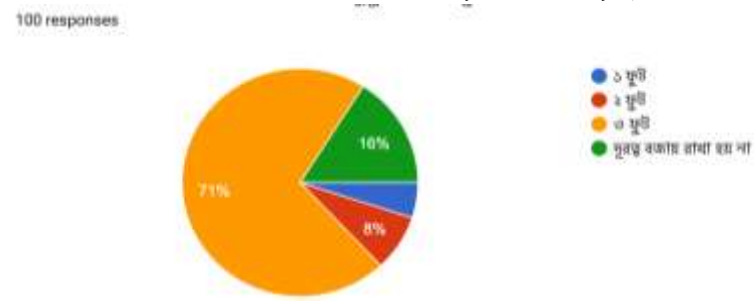

১২. আপনার এলাকায় কি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী আছে?
হ্যাঁ উত্তর দিয়েছেন ২১% এবং না বলেছেন ৭৯% উত্তরদাতা।

১৩. আইইডিসিআর ও এর সেবা বলতে আপনি কি বোঝেন?
১৮% বলেছেন, এটি একটি সরকারি অফিস যেখান থেকে প্রতিদিন সংবাদ সম্মেলন করে করোনা রোগীর আপডেট দেয়া হয়। ৭% মনে করেন, এটি একটি সরকারি অফিস যা মানুষকে আইনি সহায়তা প্রদান করে। ২৬% উত্তরদাতা বলেছেন যে এটি সরকারি রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট যা করোনা রোগীর সেবা ও চিকিৎসা দেয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৯% বলেছেন যে এ সম্পর্কে তারা কিছু জানেন না। সব মিলে প্রায় ৭৪% উত্তরদাতা এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানেন না অথবা ভুল জানেন।

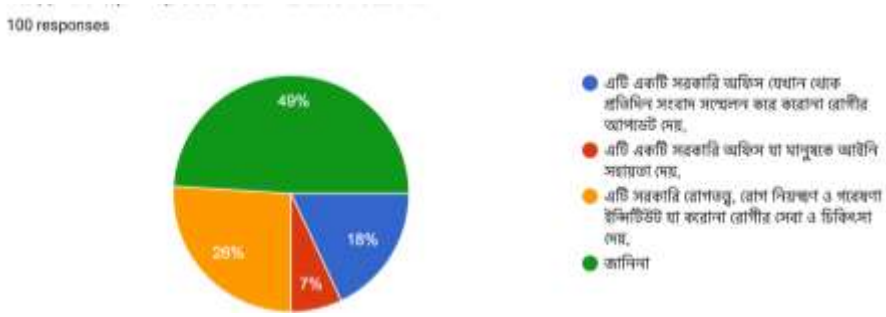

১৪. আপনার এলাকায় কারো জ্বর, সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হলে কী করবেন?

তাকে বাসায় আলাদা থাকতে বলবো এবং আইইডিসিআর দেয়া হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলবো এমন উত্তর দিয়েছেন ৫২.৫% উত্তরদাতা। বাড়ির পাশের লোকদের খবর দেবো এমন বলেছেন ১১.১%। জ্বর, ঠাণ্ডা, মাথাব্যথা ও শ্বাসকষ্টর ওষুধ খেতে বলবো ও পরিবারের সদস্যদেরকে তার সেবা-যত্ন করতে বলবো এমন বলেছেন ২৩.২% এবং জানিনা বলেছেন ১৩.১% উত্তরদাতা। **উত্তরদাতাদের প্রায় অর্ধেক জানেন না, প্রতিবেশি বা বাড়ির কারো এসব লক্ষণ দেখা দিলে কী করবেন।**

১৫. আপনি কতদিন ধরে মাস্ক ব্যবহার করেন?

মাস্ক ব্যবহার করেন না এমন উত্তরদাতা হলেন ১৯%। ৩-৪ দিন হলো শুরু করেছেন এমন সংখ্যা ১১%। ১-২ সপ্তাহ ধরে ব্যবহার করেন ২৭% এবং এক মাস ধরে ব্যবহার করছেন ৪৩% উত্তরদাতা।

১৬. মাস্ক কিভাবে ব্যবহার করা উচিৎ?

উত্তরদাতাদের ৬৪.৬% বলেছেন, সবসময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। ২০.২% বলেছেন, কেউ আক্রান্ত হলে সবসময় পরবে এবং কেউ বাইরে গেলে তখন পরবে। ৩% উত্তরদাতা বলেছেন শুধু আক্রান্ত ব্যক্তি মাস্ক পরলেই হয় আর কারো পরার প্রয়োজন নাই এবং ১২.১% উত্তরদাতা মাস্ক কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানেন না বলেছেন।

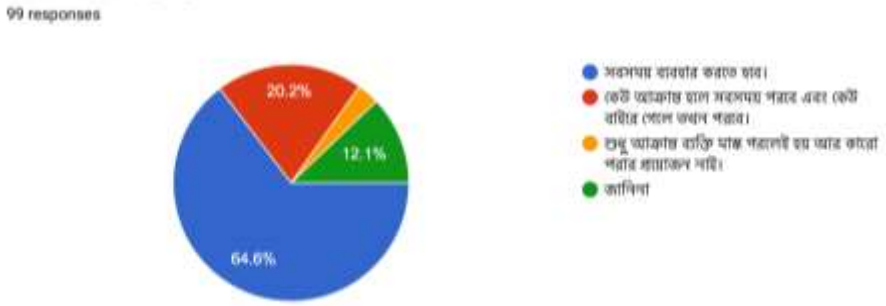

১৭. হোম কোয়ারেন্টিন বা আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা আক্রান্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তির আলাদা থাকা মানে কী?

উত্তরদাতাদের ৪৪% বলেছেন, সবার স্পর্শ থেকে দূরে আলাদা ঘরে বা আলাদা স্থানে থাকা, বিছানা ও থালাবাসন আলাদা করে দেয়াই হলো হোম কোয়ারেন্টিন। ১৩% বলেছেন, রোগীকে আলাদা রেখে নিয়মিত সেবাযত্ন করা। ১২% বলেছেন রোগীকে বাড়ির বাইরে আসতে না দেয়া এবং বাসার সবাইকে নিয়ে আলাদা থাকা। ৩১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে এ সম্পর্কে তারা কিছু জানেন না। সাধারণ মানুষের মধ্যে ৫৬% এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে এখনও জানেন না বা ভুল জানেন।

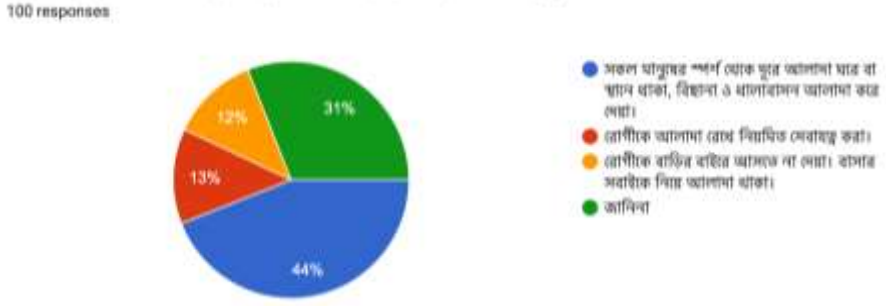

১৮. হোম কোয়ারেন্টিনে কমপক্ষে কতদিন থাকা উচিৎ?
২% বলেছেন ৭ দিন। ৭২% বলেছেন ১৪ দিন। ৩% বলেছেন ২১ দিন। ২% বলেছেন ২৮ দিন এবং ২১% উত্তরদাতা জানিনা বলেছেন। অর্থাৎ ৫৬% মানুষ হোম কোয়রেন্টিনের মেয়াদ সম্পর্কে ঠিক ধারণা রাখেন না।

৫. উপসংহার: জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলিক বিষয়গুলো ঠিকমতো মানছে না মানুষ

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন হলেও অনেক সময় উত্তরদাতা না জেনেও দৈবচয়নের মাধ্যমে সঠিক উত্তর দিয়ে দেন। অনেক সময় দেখা যায়, উত্তর সঠিক দিলেও যখন বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তারা তা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। অর্থাৎ সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের যত শতাংশ বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন বলে মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে সঠিত তথ্য জানা মানুষের সংখ্যা তার চেয়েও কম।

এবার আসা যাক তা মানার ব্যাপারে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে অনেকের পক্ষেই জানলেও মানা কঠিন। একটি বিষয় আমরা ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যম বা মূলধারার গণমাধ্যমে লক্ষ করেছি। সরকার মসজিদে বা উপাসনালয়ে যাবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিলেও কয়েকটি ছবিতে দেখা গেছে অনেক মানুষ জড়ো হয়ে মসজিদের বাইরে রাস্তায় অথবা বাসার ছাদে জমায়েত হয়ে মিলিতভাবে নামাজ আদায় করছেন। মসজিদের ভেতরে তারা নামাজ পড়লেন না ঠিকই, কিন্তু মূল যে বিষয় মানুষের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা, তা তারা মানতে পারলেন না।

দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষ যারা দিন এনে দিন খাওয়ার উপর নির্ভরশীল, তাদের পক্ষে জানলেও অনেক বিষয় মানা সম্ভব না। আমরা সবাই জানি, বাজারে এই মুহূর্তে যেসব মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে তার দাম গড়ে ৩০-৪০ টাকা। একজন অতি দরিদ্র মানুষের পক্ষে এই টাকায় মাস্ক কেনা সম্ভব নয়।

মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো এক মাসের বা ১৫ দিনের বাজার একবারে করে নিয়ে বাসায় অবস্থান করছেন। এই ১৫ দিন তাদের আর বাজারে না গেলেও চলবে। কিন্তু অনেক পরিবারের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। সামান্য যা আয় তারা করবেন, তাই দিয়েই তাদের বাজার করতে হবে। সেক্ষেত্রে হয়ত দেখা যাবে, তারা দুই দিনের বেশি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে সক্ষম নন।

কাঠামোবদ্ধ উত্তরের বাইরেও খোলামেলা আলাপে অনেকের কাছ থেকে জানা গেল, সরকারিভাবে যে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে তা এক সপ্তাহ চলার মতো পর্যাপ্ত নয়। ফলে, ত্রাণ শেষ হয়ে গেলে তাদের বাজারে যেতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, অনেক পরিবার বাইরে না গেলে তাদের পক্ষে দিনের খাবার জোগার করাই সম্ভব নয়। যেমন, ভিক্ষুক।

প্রচারনার সীমাবদ্ধতা
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে নানাবিধ ও ধরণের প্রচারণা করা হলেও এই সমীক্ষায় ব্যবহৃত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের বাইরের আলোচনায় দেখা গেছে, সেসব প্রচারণা অনেকে শুনেছেন কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারেননি। কেউ তাদের কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেনি।

অনেক ক্ষেত্রে প্রচারনা মান বাংলা ভাষায় করা হয়েছে। ফলে আঞ্চলিক ভাষায় অভ্যস্ত মানুষ সেসব কথার অর্থ বুঝতে পারেননি। অনেকের বাড়িতে রেডিও, টেলিভিশণ বা সংবাদপত্র না থাকায় তারা নিয়মিত তথ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাদের কাছে এসব তথ্য পৌঁছেছে অন্য লোকের মারফত। ফলে প্রায়ই তথ্যের বিকৃতি ঘটেছে। বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার, করোনা ভাইরাসের যেহেতু এখন পর্যন্ত কোনো টিকা, চিকিৎসা পদ্ধতি বা ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি, একমাত্র সচেতনতাই এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। এবং সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যা অতিক্রম করা না গেলে উপকূল ও চরাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন ও দরিদ্র মানুষ ব্যাপক ঝুঁকিতে থেকে যাবেন। তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও পুষ্টির মান সাধারণ মানদণ্ডের তুলনায় কম হওয়ায় তারা হয়ত আক্রান্ত হলে মৃত্যুবরণও করতে পারেন।

সমীক্ষার তথ্য ও চলমান পরিস্থিতি বিবেচনায় আমাদের সুপারিশমালা:

১. অবিলম্বে ডাক্তার, নার্সসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীকে এন-৯৫ মাস্ক, পিপিই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং হাসপাতালে আসা-যাওয়ার জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবনের

ঝুঁকি নিয়ে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের কাজ আরো কার্যকর করার জন্য তাদের উপযুক্ত আবাসন, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, পানি ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা। তাদেরকে মানসিক সাহস ও সহায়তা দেয়া।

২. ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মোট ১৯টি করোনা ভাইরাস পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। প্রত্যেক জেলায় এই পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও দ্রুত চালু করা। প্রতিদিন সারা দেশে কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক টেস্ট সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুতি নেয়া।

৩. সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যশিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে জরুরি ভিত্তিতে করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষার মৌলিক বিষয় যেমন এটি কিভাবে ছড়ায় ও এর লক্ষণ কি? যেহেতু এর চিকিৎসা বা টিকা নাই, সেজন্য প্রাথমিক প্রতিরোধই একমাত্র উপায়, এর জন্য হাত ধোয়ার নিয়ম, মাস্ক ব্যবহার, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার, শারীরিক দূরত্ব, এবং অত্যন্ত জরুরি না হলে ঘরের বাইরে না যাওয়া, হোম কোয়ারেন্টিন, আক্রান্ত হলে পরীক্ষা ও বাসায় আইসোলেশন পদ্ধতি সম্পর্কে সহজ ভাষায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো।

৪. এ কাজে দ্রুত ও কার্যকর ফল পাবার জন্য স্থানীয় এনজিও, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্লাব, সমিতি ইত্যাদিকে সরকারের সাথে কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়া।

৫. নিয়ম-শৃংখলা ঠিক রাখতে ও মানুষকে এই বিপদের দিনে সরকারি নির্দেশনাগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতে পরামর্শ দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও পুলিশের পাশাপাশি বিজিবিকেও দায়িত্ব দেয়া। এদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা এবং সেইসাথে শৃংখলা রক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র সংগঠনগুলো যেমন রোভার স্কাউট, গার্লস গাইড, বিএনসিসিকেও সরকারি বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে কাজ করার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।

৬. সরকারি বেসরকারি সকল টেলিভিশন ও রেডিওতে প্রচলিত বিনোদন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা ও করণীয় নিয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা। কমিউনিটি রেডিও এবং স্থানীয় ডিস/ক্যাবল অপারেটরদেরকে অনুষ্ঠানগুলো প্রচারের নির্দেশনা দেয়া।

৭. জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় পর্যায়ে ধর্মীয় নেতাদের সকল প্রচারণা কাজে অন্তর্ভুক্ত করা। মসজিদে আজানের পর পর মুসল্লীদের ঘরেই নামাজ পড়ার ব্যাপারে অনুরোধ ঘোষণা করা।

৮. ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা এড়ানোর জন্য তার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সকল পক্ষের প্রতিনিধিত্ব এতে সংযুক্ত করা। রাজনৈতিক দল, সাংবাদিক, ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দকে এতে যুক্ত করা। ত্রাণ সরবরাহের জন্য সমাজের চাহিদা ভিত্তিক অগ্রাধিকার গ্রুপ নির্বাচন করা এবং কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে বিতরণ করা।

৯. করোনা আক্রান্ত মৃতদেহ সৎকারের ক্ষেত্রে জনমনে এখনও অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং যারা সৎকার করবেন (গোরস্থান কমিটি/ শ্বশান কমিটি, ইত্যাদি) তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পিপিই সরবরাহ নিশ্চিত করা। তাদেরকে প্রণোদনা ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা। এই কাজ করার মাধ্যমে তারা যে বীরত্ব প্রদর্শন করছেন তার জন্য তাদের প্রশংসা করা ও সাহস দেয়া।

১০. পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, বাজার কমিটি ইত্যাদির সহায়তায় নিয়মিত কিছু স্থানে জীবানুনাশক ছড়ানো। বিশেষ করে ধাতব পদার্থ যা অনেক মানুষের স্পর্শে আসে, যেমন যানবাহনের ধাতব হাতল, ওভারব্রিজের রেলিং ইত্যাদি নিয়মিত জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করা।

১১. স্বাস্থ্যবিধি ও সুরক্ষা মেনে কিছু জরুরি খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন চালিয়ে যাবার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা ও স্বাস্থ্য বিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান করা। কারণ, এটি সারা দেশের মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে এ কাজে দক্ষ এনজিও ও সীমিত পরিসরে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

সংযুক্তি:

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও এর বিশ্লেষণের পূর্ণ লিংক–

https://docs.google.com/forms/d/19Yg_5d91HVa_qb3xCCEAwJqx_xFodbJ9iJtE5cOGnLI/edit#responses